icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৬ ■ সংখ্যা ১ ■ শ্রাবণ ১৪১৪

কান-পাকা রোগে অবহেলার সুযোগ নেই

মুহঃ শামীম বিন সাঈদ খান
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
আইসিডিডিআর,বি

শেকড়ের বয়স চার বছর। তার মা চাকুরিজীবী একজন ব্যস্ত মহিলা। এখন থেকে আড়াই বছর আগে শেকড়ের বাম কানে প্রচন্ড ব্যথার সঙ্গে জ্বর হয়েছিলো। দুই-তিন দিনের মাথায় হঠাৎ তার বাম কান দিয়ে পুঁজ-পড়া শুরু হলো। সেই সাথে তার কানের ব্যথা কমে গেলো এবং জ্বরও চলে গেলো। অল্প কিছু অষুধ সেবন করার ফলে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলো। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করছিলো ভবিষ্যতের এক বিরাট কষ্ট। তা হলো তার কান দিয়ে পুঁজ-পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি এবং বাম কানে কিছুটা কম শুনতে লাগলো।

কেন এমন হলো শেকড়ের? আসলে কী ঘটেছিলো তার কানে। সে প্রায়ই রাতে ঘুমের মধ্যে মায়ের দুধ খেতো। খেতে খেতে যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন সম্ভবত অপরিচ্ছন্নতার কারণে জীবাণু দ্বারা দূষিত কিছু দুধ গলার ভিতর থেকে মধ্যকর্ণের সংযোগকারী নল (auditory tube)-এর মাধ্যমে ঢুকে পড়তো। এতে তার মধ্যকর্ণে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে সংযোগকারী নল সম্ভবত বন্ধ হয়ে যেতো। মায়ের দুধ শিশুর জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য, কিন্তু যথাযথ নিয়মে তা খাওয়াতে হবে। মধ্যকর্ণের প্রদাহের ফলে উৎপাদিত পুঁজ উচ্চ চাপে পর্দা ফুটো ক'রে কানের বাইরে সম্ভবত বের হয়ে আসতো। অপর্যাপ্ত চিকিৎসার ফলে তার ফুটো পর্দা দিনে দিনে বড় হচ্ছিলো এবং তার কষ্ট বেড়েই চলছিলো।

মধ্যকর্ণের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রদাহ বাংলাদেশসহ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বধিরতার একটা অন্যতম কারণ।

অপর্যাপ্ত ও সঠিক চিকিৎসার অভাবে এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে মধ্যকর্ণের স্বল্প-মেয়াদী প্রদাহ দীর্ঘ-মেয়াদী প্রদাহে পরিণত হয়েছে।

মধ্যকর্ণের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রদাহের প্রধান প্রধান কারণ

- বার বার শ্বাসযন্ত্রের উপরের অংশে, যেমন নাকের ভিতর, গলার পিছনের অংশে সংক্রমণ ও প্রদাহের সৃষ্টি-হওয়া
- সাইনোসাইটিস রোগে আক্রান্ত-হওয়া
- নাকের ভিতর এলার্জি (allergic rhinitis) হওয়া
- শিশুদের নাকের পিছনের দিকে অবস্থিত অ্যাডেনোয়েড (adenoid) গ্রন্থিটি বড়-হওয়া
- টনসিলে বার বার সংক্রমণ-ঘটা
- পুকুর, নদী-নালা ও খাল-বিলের দূষিত পানিতে গোসল-করা
- দূষিত পদার্থ দিয়ে কান-খোঁচানো
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (immunity) কম থাকা কিংবা ধীরে ধীরে কমে যাওয়া
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞতা

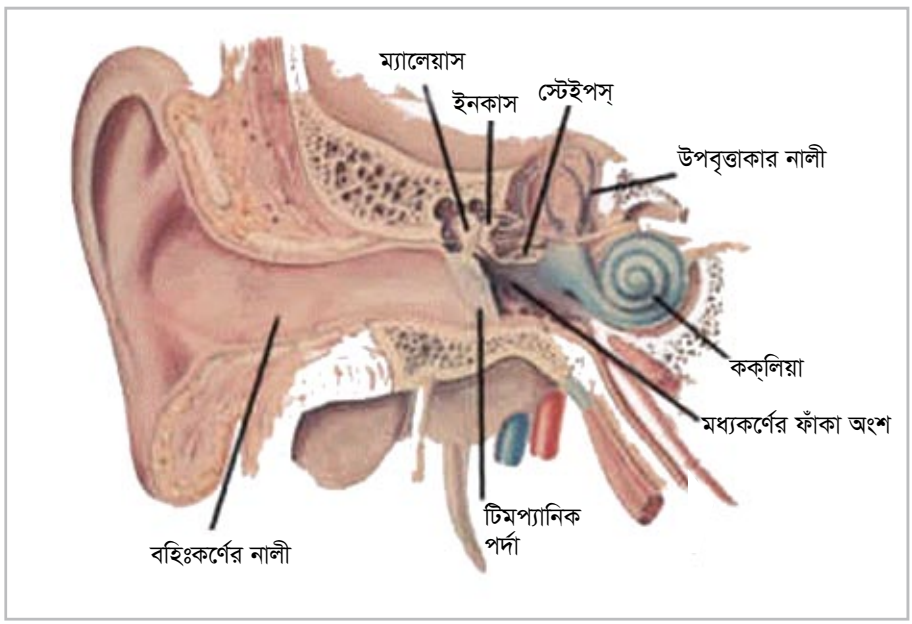

শ্রবণযন্ত্রে মধ্যকর্ণের অবস্থান (ছবি: ইন্টারনেট)

কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে

- কান দিয়ে পুঁজ বা পুঁজজাতীয় তরল পদার্থ বার বার বের হয়ে-আসা
- ধীরে ধীরে কানে কম-শুনা। কী পরিমাণ কম শুনবে তা নির্ভর করে পর্দায় ফুটোর অবস্থান ও আকারের ওপর
- ব্যথা সাধারণত থাকে না। তবে বার বার প্রদাহের ফলে কিছুটা ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

উপরোক্ত উপসর্গসম্পন্ন রোগীকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা হলে তার নাকের ভিতর সাইনাসে কিংবা টনসিল ও অ্যাডেনোয়েড (adenoid) গ্রন্থিতে প্রদাহ ও সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। যেসব উপসর্গ ও লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো তা সাধারণত নিরাপদ প্রকৃতির (CSOM-safe variety) মধ্যকর্ণের প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে। তবে কানের দীর্ঘ-মেয়াদী প্রদাহ সব সময় নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে বিপজ্জনক (CSOM-unsafe variety) প্রকৃতির কানের প্রদাহেও রোগীরা আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাথা-ঘোরানো, মুখমণ্ডল বাঁকা-হওয়া, বহিঃকর্ণের বা মস্তিষ্কের ভিতর ফোঁড়াসহ আরো অনেক উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। অপরিষ্কার ও জীবাণু দ্বারা দুষিত যন্ত্রপাতি দিয়ে কান পরিষ্কার করার কারণে কানের নানারূপ জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। কান-পাকা রোগের জন্য ধনুষ্টংকারও হতে পারে।

ভেতরের পাতায়

বন্যাজনিত রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায় ২
জেন্ডার বৈষম্য কিভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে ৭
জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রাথমিক পরিচর্যা ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিস্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম এ রহিম
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ	হামিদা আক্তার

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান, রুবহানা রকিব ও পিটার থর্প।

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্কুল গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ফোন: ৯১১১৪৩৩

মারাত্মকভাবে সংক্রামিত মধ্যকর্ণের অবস্থা (ছবি: ইন্টারনেট)

প্রতিকার

নিরাপদ প্রকৃতির কানের প্রদাহের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা হলো:

- কান পরিষ্কার রাখতে হবে। এর জন্য জীবাণুমুক্ত তুলা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে
- অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় অষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে কানের পুঁজে যেধরনের জীবাণু থাকে শুধুমাত্র তার ওপর কার্যকর অষুধ ব্যবহার করলে যথোপযুক্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। পুঁজের কালচার (culture) এবং অষুধের সেন্সিটিভিটি (sensitivity) পরীক্ষারও প্রয়োজন হতে পারে
- অ্যান্টিবায়োটিক অষুধ সেবনের পাশাপাশি কানের উন্নত মানের ড্রপ, যেমন Polycort, Otosporin, Genticyn HC—এসব ব্যবহার করতে হবে। কানের ড্রপ ৩ থেকে ৫ ফোঁটা দিনে ৩ বার ২ থেকে ৩ সপ্তাহের অধিক সময় লাগানোর প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনতা

- কোনো অবস্থাতেই কানের ভিতর দুধ, পানি বা ময়লা ঢুকতে পারে এমন অবস্থাকে রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে সরিষার বা নারিকেল তেলে তুলা ভিজিয়ে কানে গুঁজে দিয়ে গোসল করতে হবে
- কখনোই ডুব দিয়ে গোসল করা কিংবা সাঁতার কাটা যাবে না। অল্প পানিতে সাঁতার কাটলেও কান-পাকা রোগী ডুবে মরে যেতে পারে, কারণ শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি বা কম তাপমাত্রায় পানি কানের ভিতর ঢুকলে মাথা-ঘোরানো রোগ হয়ে পানিতে ডুবে যেতে পারে
- অপরিষ্কার ও জীবাণু-দূষিত তুলা বা যন্ত্র দিয়ে কান পরিষ্কার করা যাবে না
- টিটেনাস টিকার কোর্স অসম্পূর্ণ থাকলে তা সম্পন্ন করতে হবে
- রোগীর পুষ্টিহীনতা দূর করতে হবে ■

বন্যাজনিত রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায়

আইসিডিডিআর,বি-প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের ওপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন

বন্যা বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী, আর বন্যাজনিত রোগ ব্যবস্থাপনায় আইসিডিডিআর,বি-কেই বরাবর নিতে হয় অগ্রণী ভূমিকা। বন্যা ও বন্যা-উত্তর পরিস্থিতিকে একটা ভয়াবহ মানব-বিপর্যয় বলা চলে। বন্যার সময় ডায়রিয়াজাতীয় এবং অন্য অনেক রোগ ভয়াবহ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের মহাখালিতে এবং চাঁদপুর জেলার মতলবে আইসিডিডিআর,বি-র হাসপাতালে রোগীর ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে, রোগীদের স্থান সংকুলানের জন্য তাঁবু খাটিয়ে হাস-পাতাল দু'টিকে সম্প্রসারিত করতে হয়। এখানে চিকিৎসা নিয়ে হাজার হাজার রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

এ-বছরের বন্যার সময় ১৬ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলো ও আইসিডিডিআর,বি-র যৌথ উদ্যোগে একটি গোল-টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো বন্যাজনিত রোগব্যাধির কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। দৈনিক প্রথম আলো'র যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবদুল কাইয়ুম-এর সভাপতিত্বে আইসিডিডিআর,বি-তে অনু-ষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ), বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ কে এম জাফর উলাহ খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস, মূল নিবন্ধ পাঠ করেন আইসিডিডিআর,বি-র ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন-এর পরিচালক ডাঃ এম এ সালাম। আলোচক হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন: জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক মি. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রফেসর ডাঃ ফাতেমা পারভীন চৌধুরী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবদুর রব। আইসিডিডিআর,বি-র আরো যে ক'জন বিশেষজ্ঞ তাঁদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বন্যাজনিত রোগ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: এনভাইরনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি'র প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম, কিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশনের সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. প্রদীপ কে বর্ধন, পুষ্টি কার্যক্রমের প্রধান

গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ (ছবি: ফখরুল)

ড. তাহমিদ আহমেদ, শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রধান ড. শামস্ এল আরিফীন, ইমিউনোলজি ল্যাবরেটরি-র প্রধান ড. ফিরদৌসী কাদরী, নিউট্রিশনাল বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি-র প্রধান মি. এম এ ওয়াহেদ, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশনের ড. মনিরুল আলম, এবং আইসিডিডিআর,বি-র মতলব উপকেন্দ্রের প্রধান ড. মোঃ ইউনুস। আইসিডিডিআর,বি-র এক্সটারনাল রিলেশন্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান ড. ইশতিয়াক জামান এই গোল-টেবিল আলোচনায় সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

আলোচকদের পরিবেশিত নানা মূল্যবান তথ্য বন্যাজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলায় আমাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়ক হবে এবং রোগব্যাধি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো--এই বিবেচনায় তাঁদের বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে স্বাস্থ্য সংলাপের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছি।

অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে সভাপতি জনাব কাইয়ুম বলেন:

আজ বিপুলসংখ্যক মানুষ কেন আইসিডিডিআর,বি-তে আসছে তার একটা কারণ আছে! আমার মনে পরে ১৯৮০ সালে আমার প্রথম সন্তান খুব ছোট, ৬ মাসের। তার মারাত্মক ডায়রিয়া হয়, তখন প্রফেসর তালুকদারের কাছে তাকে নিয়ে যাই। তিনি একটা অষুধ দেন এবং তাঁর ডিসপেনসারিতে সহকারীকে বলেন কয়েক প্যাকেট খাওয়ার স্যালাইন বানিয়ে দিতে। তখন সবেমাত্র আইসিডিডিআর,বি স্যালাইনের ফর্মুলাটা বের করেছে কিন্তু প্যাকেট হিসেবে আমরা পাই নি। আমি দেখলাম তাঁর সহকারী গুড়-লবণ মিলিয়ে স্যালাইন বানিয়ে দিলো এবং পাঁচ প্যাকেট দিয়ে বললো: এটা এভাবে খাওয়াবেন। আইসিডিডিআর,বি-তে এসে পায়খানা পরীক্ষা করার পর সামান্য চিকিৎসায় আমার ছেলে ভালো হয়ে গেলো। বন্যা-উত্তর পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম কাজটি হবে বিশুদ্ধ পানি এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা। কারণ বন্যার সময় মানুষের পুষ্টির অভাব দেখা দেয়, আর পুষ্টির অভাব হলে খুব সহজেই কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করাটা একটু কষ্টকর, তবে বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট যদি আমরা দিতে পারি তবে এ-সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা: শুধুমাত্র খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুলেই ডায়রিয়া সংক্রমণের হার ৫০-৬০% কমে যাবে। যদি ডায়রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় তখন একমুঠ গুড়, এক চিমটি লবণ আর এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানির মধ্যে গুলিয়ে খাওয়া শুরু করলেই আমার মনে হয় ডায়রিয়াতে মৃত্যুর আশংকা একেবারে শূন্যের কোঠায় চলে আসবে। কারণ ডায়রিয়ার প্রধান অসুবিধাটা হলো শরীর থেকে পানির সাথে ইলেকট্রোলাইট বা খনিজ পদার্থ বেরিয়ে যায় এবং এগুলোর অভাব পূরণের জন্য রিহাইড্রেশন করাটা খুবই জরুরী। গুড়ের মধ্যে আছে পটাশিয়াম আর লবণের মধ্যে আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, তাই খনিজের অভাব পূরণের কাজটি খুবই সহজ। এ-বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ) প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন:

আমার জীবনের ৪৭ বছরের ডাক্তারী পেশার প্রায় সবটুকু সময়ই আমি আইসিডিডিআর,বি-র সাথে কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত। আমাদের বৈঠকে আজ কাইয়ুম সাহেব তো সব ডাক্তারকে হার মানিয়ে দিয়েছেন, কারণ ডায়রিয়াটাকে এত সংক্ষেপে কেউ বর্ণনা করবেন না। কেউ কেউ বিরাট বিরাট থিউরি নিয়ে আসবেন. . .ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া, ভাইরাল ডায়রিয়া, প্রোটোজোয়ান ডায়রিয়া, হেলমিনথিক ডায়রিয়া--এসব হলো ডাক্তারদের ভাষা। কিন্তু সহজ ভাষা হলো: ডায়রিয়া হয়ে যাওয়ার পরপর খাবার স্যালাইন খাওয়ান। বিশুদ্ধ পানি দিয়ে এইটা বানান। উনি বলেছেন গুড় দিয়ে বানান, এটা খান, তাতে যদি ভালো না-হয় দৌড়ান, এক জায়গায় যান, সেটা হলো আইসিডিডিআর,বি। আইভি স্যালাইন দিয়ে দিবে, তারপরও দরকার হলে অষুধ খাওয়াবে। দু'টি ট্যাবলেট: এজিথ্রোমাইসিন নতুবা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন। এতেই সব শেষ। আইসিডিডিআর,বি-তে এই দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে আমরা তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি; রোগীরা আসে, এক থেকে দুই দিনের মধ্যে, অনেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বা একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা দুই বছর পরপর দেখি বন্যা আসে, দুই বছর পরপর আমরা এই অসুবিধাগুলোতে পড়ি। আইসিডিডিআর,বি যেভাবে তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে আমি মনে করি এটা সবচেয়ে উন্নত। আমরাও সবগুলো মেডিকেল কলেজে ডায়রিয়া সেন্টার খুলে দিয়েছি। গতকাল রেড ক্রিসেন্ট-এর একজনকে বললাম: আইসিডিডিআর,বি সবচেয়ে বড় হসপিটাল, যে হসপিটালকে ১৯৫৯ সালে আমি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম আমি একজন ডাক্তার হবো।

এখন বন্যার পানির নিচে চলে যাওয়ার ফলে স্যুয়ারেজ পাইপলাইন-এর পানি আর খাবার পানি হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য নয়। দুর্গত মানুষের পুনর্বাসন এখন সবচেয়ে বড় কথা। আরো একটা বিষয় হলো নিউট্রিশন বা পুষ্টি। পুষ্টি যদি আমরা না-দিতে পারি, খাবার-দাবার যদি আমরা না-দিতে পারি, তাহলে ডায়রিযার অষুধ দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি কলেরা বললেই মানুষ ভয় পেয়ে যেতো। এখন আর এটা কিছুই নয়, এটা ডায়রিয়ার একটা বিশেষ রূপ। অনেক জীবাণু দিয়ে ডায়রিয়া হচ্ছে, ভাইরাস দিয়ে হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার যে, এবারকার ডায়রিয়াটা মারাত্মক। শতকরা পঁচাত্তর ভাগের মত পানি চলে যাচ্ছে। আমার কথা হলো: রোগীরা ভালো হয়ে যখন বাড়ি যাবেন তখনও তারা যেন সরকারের দেওয়া বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট দিয়ে পানিকে বিশুদ্ধ করে নেন। পরবর্তী কালে তো পরিষ্কার পানি সাপ্লাই'র কাজটি স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোই করবে। বাচ্চাদের ডায়রিয়ায় জিঙ্ক ট্যাবলেট দিতে পারলে খুবই ভালো।"

বিশেষ অতিথি জনাব এ কে এম জাফর উল্লাহ্ খান তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে:

আইসিডিডিআর,বি বন্যা-পরবর্তী ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব নিয়ে কিভাবে হিমসিম খাচ্ছে তা আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি: আইসিডিডিআর,বি-র ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী একদিনে এখানে

এসেছে। মানুষ যখন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়, ঢাকা বা ঢাকার আশ-পাশের লোকজনের লক্ষ্য থাকে আইসিডিডিআর,বি-তে যাওয়া।

আমরা দেখেছি আইসিডিডিআর,বি-র নিজস্ব যে অবকাঠামো তার বাইরেও তাঁবু খাটিয়ে এখান-কার ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা দিচ্ছে। তাতে স্বাভাবিকভাবে রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের মনে এ-প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বিষয়ে একটা কনফিডেন্স, একটা নির্ভরশীলতা কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই যেহেতু ডায়রিয়ার জন্য বিশেষ হাসপাতাল, এখানে এসে ভালো চিকিৎসা পাবে এই প্রত্যাশা সবার থাকবে। আমরা এবারের বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে ডায়রিয়া পরিস্থিতি, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের ডায়রিয়া।

স্থানান্তর করে এখানকার জায়গাটা খালি করে নতুন রোগীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

মূল নিবন্ধে ডাঃ এম এ সালাম বাংলাদেশে বন্যার কারণ বিশ্লেষণ করে রোগ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বলেন:

বাংলাদেশের যে ভৌগলিক অবস্থান তাতে বন্যা হওয়ার একটা আশংকা থাকবে এবং যেহেতু আমরা বন্যার সাথে স্বাস্থ্যসমস্যার কথা বলছি সেই স্বাস্থ্যসমস্যাগুলোও থেকে যাবে যদি আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না-নিতে পারি। যেহেতু এর সাথে পানি, খাদ্য, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি সাপ্লাই ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—এসব জড়িত, যতদিন পর্যন্ত এসব সমস্যার সমাধান না-হবে এই সমস্যাগুলো নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে আরো অনেকদিন। তবে যাতে প্রাণহানি কম হয়, যাতে আমাদের স্বাস্থ্যহানি কম ঘটে সে-ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই আমরা নিতে পারবো এবং সে-দিকেই

প্রত্যেকবার বন্যার সময় আইসিডিডিআর,বি-তে রোগীর ভিড় বেড়ে যায়। মূল হাসপাতালের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে রোগীদের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা হয়। এবারের বন্যায় রোগীর ভিড় এতটাই বেড়ে গিয়েছিলো যে, কেন্দ্রের গ্যারেজ এলাকাকেও অস্থায়ী হাসপাতালে রূপান্তরিত করতে হয়েছে (ছবি: ফখরুল)

অন্যান্য জেলার ডায়রিয়া অনেকটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে; মৃত্যুর সংখ্যাও খুব বেশি হয় নাই। আমরা আগে থেকে প্রচার করছি যে, খাবার স্যালাইন খেতে হবে। পানি বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট প্রচুর আছে, আমরা দিচ্ছিও, কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় না যে, এটা পরিপূর্ণভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে। তার প্রমাণ হিসেবে এখন এত ডায়রিয়া রোগী এখানে আসছে। তবে আশার কথা, যে-সংখ্যায় রোগী আসছে সেটাকে মোকাবিলা করতে আইসিডিডিআর,বি-র সাথে আমাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করছে। সেনাবাহিনীর কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে সবখানেই ডায়রিয়া রোগীকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। আইসিডিডিআর,বি-র সাথে এরকম একটা সহযোগিতার পন্থা আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি, যাতে এখান থেকে কিছু রোগীকে

আমাদের চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। যদিও আমরা এর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ দু'টোরই ব্যবস্থা করতে চাই।

আমরা যদি বন্যার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো দেখতে চাই, তবে এটাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে সরাসরি জান-মালের ক্ষতি। বন্যার সময় দ্বিতীয় যে-জিনিসটা ঘটে সেটা হচ্ছে মানুষের আবাস পরিবর্তন--সেখানে কিছু স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিবে, সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারই যেখানে মূল সমস্যা। আক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি তাদের নিজস্ব আবাসস্থলেও থাকেন এবং তার চারিদিকে যদি পানি থাকে তারা গৃহবন্দী হবেন। গৃহবন্দী হয়ে থাকলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার একটা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যখন তারা আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে যাবে তখন এটা আরও তাড়াতাড়ি অনেক লোকের মধ্যে ছড়াবে।

বন্যা পরিস্থিতির কারণে ঘরবাড়িতে সাপ চলে আসে। অতএব সাপের কামড়ে কিছু মানুষ মরে যায়। মাঠের বা গাছের ইঁদুরও চলে আসবে তার বাঁচার তাগিদে। এসব ইঁদুর অনেক সংক্রামক ব্যাধি ছড়ায়। প্রথম জিনিসটা হলো পানি এবং খাবার। বন্যার সময় প্রথমেই মানুষ এই দু'টো জিনিসের অভাবে ভুগতে থাকে এবং তার মধ্যেও খাবার আমরা একবেলা, দু'বেলা, তিনবেলা না-খেয়ে থাকতে পারি কিন্তু পানি তিনবেলা না-খেয়ে বা একদিন না-খেয়েও থাকা সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসছে ডায়রিয়া। আমাদের দেশে যেসব ডায়রিয়া হয় সেগুলো মূলত পানিবাহিত। এর সাথে খাবার তৈরি করার ব্যবস্থা বন্যা-কবলিত মানুষের নেই এবং দুষিত খাবারের মাধ্যমেই পেটের পীড়া এবং ডায়রিয়াজনিত রোগ হচ্ছে। আমাদের পানি এবং খাবার এই দু'টো যদি আমরা ঠিকমত সরবরাহ করতে না-পারি তাহলে এর প্রকোপকে আমরা দমিয়ে রাখতে পারবো না। লোকজনকে স্বাস্থ্যবিধি শেখানোর একটা দায়িত্ব আমাদের রয়ে গেছে। বন্যার সাথে সাথে পয়ঃব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যার ফলে ডায়রিয়াজনিত যেসব রোগ আছে সেগুলো আরও বেশি করে ছড়ায়।

পানি এবং খাদ্যসম্বন্ধীয় যেসব প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দেয় এগুলোকেও আমি তিন ভাগে ভাগ করতে চাই। প্রথমত বন্যা শুরু হওয়ার পর যখন পানি এবং খাদ্যের সমস্যা দেখা দেয় তখনই ডায়রিয়া এবং আমাশয় দেখা দেয়। তার কয়েকদিন পরে ডায়রিয়ায় যেসব রোগ-জীবাণু ছড়ায় সেসব রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে যখন ঢোকে তখন খুব তাড়াতাড়ি তাদের বিস্তৃতি ঘটে এবং আরো রোগের সৃষ্টি করে। অধিকন্তু খাবার এবং পানির মাধ্যমে আরও কিছু রোগ-জীবাণু শরীরে যেতে পারে। তারা বংশ বিস্তার করে মানুষকে অসুস্থ করার জন্য একটু বেশি সময় নেয়। অতএব, ডায়রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে টাইফয়েড জ্বরের সম্ভাবনা রয়েছে; হেপাটাইটিস জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর পরের পর্যায়ে যখন আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিজের বাসায় যায় তখনও যদি তারা পানিবন্দী অবস্থায় থাকে, তখন পরিবারের সবাই কাছাকাছি থাকার কারণে আরও কিছু অসুখ বাধায়, যেমন নিউমোনিয়া ও চর্মরোগ। পরবর্তী পর্যায়েও আমাদের স্বাস্থ্যসমস্যা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। কেননা বন্যাকালীন পর্যায়ে যে খাবারের অসুবিধাটা হচ্ছে, কম খাবার খাওয়া হচ্ছে, তার প্রভাব আমরা দেখবো বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে। আবার কিছু সংক্রামক ব্যাধি আছে যার প্রকোপ দেখতে অনেক সময় লাগে, যেমন যক্ষা। জনাকীর্ণ জায়গায় কোনো যক্ষারোগী থাকলে তিনি তা অন্য মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারেন কিন্তু নতুনভাবে যিনি আক্রান্ত হলেন তার যক্ষার প্রমাণ পেতে আরও সময় লাগবে।

বন্যা-পূর্ববর্তী পর্যায়ে আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে আফ্রিকার

গোমা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে। আইসিডিডিআর,বি-র দলনেতা ছিলেন ডাঃ এ কে এম সিদ্দিক। ১৯৯৪ সালে ওখানে ৩-৪ সপ্তাহে ৫০ হাজার লোক মারা গিয়েছিলো এবং একটা চিকিৎসা কেন্দ্রে একদিনে মৃত্যুর হার ছিলো ৪৯%। আমরা যাওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সেটাকে আমরা মোকাবিলা করতে পেরেছি। কিন্তু প্রথমে আমরা গিয়ে দেখেছি যে, ওখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। কিন্তু কারো সাথে কারো কোনো সমন্বয় নেই, কোনো কেন্দ্রে মৃত্যুহার ৪৯%, কোনোটিতে ৯%, আবার কোনোটিতে ১০%। এরকম হওয়ার কথা নয়। যদি একই চিকিৎসা-ব্যবস্থা সব জায়গায় বিদ্যমান থাকে তাহলে মৃত্যুহার মোটামোটি একই থাকার কথা। বছরের যে-সময়ে বন্যা হতে পারে তার আগেই অন্তত কয়েকদিন চলার মত কিছু শিরায় দেওয়ার স্যালাইন ও খাবার স্যালাইন, অষুধ, শিরায় স্যালাইন দেওয়ার জন্য নিডল্, সিরিঞ্জ, স্পিরিট, ইত্যাদি সরবরাহ ক'রে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। তিন-চারদিন সময় পেলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

এমন একটা সমন্বিত তথ্য প্রদান ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন যারাই এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন তারা সবাই একই তথ্য পেতে পারেন। একেক বারের বন্যায় আমাদের একেক রকম শিক্ষা হয়। অতএব, আমাদেরকে শনাক্ত করতে হবে আমরা এবারের বন্যা থেকে কী কী শিক্ষা পেলাম। সেটার সমাধান আমরা কিভাবে করেছি, তার সারাংশ সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আমরা পরবর্তী বন্যার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় একে কাজে লাগাতে পারি।

আইসিডিডিআর,বি-র ডাঃ প্রদীপ কে বর্ধন তার বক্তব্যে বলেন:

আমাদের সাংবাদিকগণ প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করেন ডায়রিয়া কেন হয়। ডায়রিয়া হওয়ার অনেক অনেক কারণ আছে। একটি-দু'টি নয়, অনেক রকম জীবাণু রয়েছে যা ডায়রিয়া রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ডায়রিয়া সৃষ্টিকারী যত জীবাণু রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই হচ্ছে পানিবাহিত। বিশুদ্ধ পানি না-পেলে ব্যবহারের অযোগ্য পানিই আমাদের ব্যবহার করতে হয়। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন না-থাকে তাহলে বর্জ্য পদার্থ থেকে সেই জীবাণুগুলো আরো ছড়াতে থাকে। পরিশুদ্ধ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে না-পারলে ডায়রিয়া থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা আমাদের কাছে আসছে এবং লক্ষ করা গেছে, এসব জায়গার সবগুলোই বন্যা-কবলিত নয়। কাজেই বন্যা হয়েছে বলেই ডায়রিয়া হচ্ছে এমন ধারণা সঠিক নয়। আইসিডিডিআর,বি-তে আমরা প্রতিবছরই বন্যার সময় যে-চিত্র দেখি, এ-বছর তার মধ্যে কিছু অভিনবত্ব রয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে: আমরা কখনো আইসিডিডিআর,বি-তে একসাথে এত রোগী দেখি নি। ভেবে দেখতে হবে ডায়রিয়া কেন বেশি হচ্ছে, রোগীরা বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখানে ছুটে আসছে কি না, নাকি অন্য কোথাও যেতে না-পেরে আমাদের কাছে আসছে। আমার ধারণা এর সবগুলো কারণই কাজ করছে। আমি বাইরের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু এ-বছর মনে হচ্ছে ঢাকার আশ-পাশের এলাকায় ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশি বেড়েছে এবং রোগীরাও কিছুটা চিন্তিত। একদিকে এটা ভালো যে, ডায়রিয়ার চিকিৎসা দরকার এ-বিষয়ে গণসচেতনতা বেড়েছে। গত ৪৫ বছর ধরে আইসিডিডিআর,বি'র স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই হাসপাতালে ডায়রিয়ার চিকিৎসা চলে আসছে এবং এই প্রতিষ্ঠান রোগীদের ভরসাস্থল হিসেবে আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।

সাংবাদিক মহলকে আমি অনুরোধ করছি এই তথ্য তাদের গণমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য যে, ডায়রিয়া হলে যেন সাথে সাথে বাড়িতেই চিকিৎসা শুরু করা হয় অর্থাৎ খাবার স্যালাইন খাওয়ানো হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই তা করা যায়। খাবার স্যালাইন এখন অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যদি না-পাওয়া যায় তবে চিনি বা গুড় এবং লবণ দিয়ে কিভাবে তা তৈরি করতে হয় এ-বিষয়ে গণমাধ্যম মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে। তা করলে অনেক সময় রোগীকে আর হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যদি এমন মারাত্মক ডায়রিয়া হয় যে খাবার স্যালাইনেও কাজ হচ্ছে না তখন রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে আনতে হবে। বাড়িতে স্যালাইন খাওয়ালে অতটা মুমূর্ষ অবস্থায় রোগীকে আসতে হবে না। বাড়িতে চিকিৎসা দিলে পুষ্টির বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধদের বেলায় তা অত্যন্ত জরুরী। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের বেলায় কোনোক্রমেই মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। অন্য রোগীরাও স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যাবে। ডায়রিয়ায় মূল সমস্যা হচ্ছে পানিশূন্যতা। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হলে শিরায় স্যালাইন দিয়ে অর্থাৎ পানিশূন্যতা রোধ করে আমরা তাকে সুস্থ করে তুলি। খাবার স্যালাইন কাজ না-করলেই কেবল আমরা তা করি। অনেক সময় অবস্থা বুঝে অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার করি। ছোঁয়াচে রোগের বেলায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার কিছু নিয়ম আছে। রোগটা কী কারণে হয়েছে সে-সম্পর্কে ধারণা করে কোন রোগীর জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা ভালো হবে তা আমরা ঠিক করি। ব্যবহার-বিধিটাও মেনে চলতে হবে। আমরা বর্তমানে এজিথ্রোমাইসিন নামে একটি অষুধ ব্যবহার করছি যেটা একবার দিলেই চলে। এটা হয়তো আজকে ব্যবহার করছি, দুইমাস পরেই হয়তো পাল্টে যেতে পারে। শিশুদের বেলায় আমরা জিঙ্ক ট্যাবলেট দিচ্ছি। ডায়রিয়া হলে জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়ালে পরবর্তী কালে ডায়রিয়া সহজে হয় না। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, বন্যার ঠিক পর পর আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস ও চর্মরোগ দেখা দেয়। অপুষ্টিও একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। আইসিডিডিআর,বি যদিও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে, এটি মূলত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আমরা চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আগে যে খাবার স্যালাইন ছিলো এখন তার চেয়েও উন্নত ধরনের স্যালাইন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা এখনও চেষ্টা করছি এই খাবার স্যালাইনটাকে আরও উন্নত করতে। একই সঙ্গে এটাও পরীক্ষা করে দেখছি, কোন ক্ষেত্রে কোন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রোগ নিরাময় সহজ ও দ্রুত হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য কোনো অষুধ আছে কি না সে-বিষয়েও গবেষণা চলছে। ছোঁয়াচে রোগের জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা। আইসিডিডিআর,বি ছাড়াও অন্যান্য হাসপাতালে যারা ডায়রিয়ার চিকিৎসা চালাচ্ছেন তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আইসিডিডিআর,বি-র সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কাজটা করতে পারলে আইসিডিডিআর,বি-র গত ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতা জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হতে পারে।

আইসিডিডিআর,বি-র পুষ্টিবিজ্ঞানী ড. তাহমিদ আহমেদ বলেন:

২০০৪ সালে খুব বড় বন্যা হয়েছিলো। সেই বন্যার সময় আমরা জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটা জরিপ করেছিলাম। নিপোর্ট এবং আইপিএইচএন-এর সাথে আমরা সে-কাজ করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে আমরা বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করলাম। বন্যা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা চিন্তা করলাম: এই একটা সুযোগ বন্যার পর শিশুদের পুষ্টির ওপর বন্যার কী প্রভাব পড়ে তা খতিয়ে দেখার। দেশের লোক, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, কিভাবে পুষ্টি সমস্যার মোকাবিলা করে, জরিপটা ছিলো তা জানার জন্যই। সেই জরিপে প্রাপ্ত চিত্রটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ইতিহাস ঘেঁটে দেখলাম, বাংলাদেশে ১৭৮১ সন থেকে বন্যার রেকর্ড আছে। এই রেকর্ডগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: বড় বন্যা প্রতি সাত বছর পর পর আসে এবং খুব তীব্র আকারের বন্যা ৩০ থেকে ৫০ বছর পর পর আসে। ২০০৪ সালে যে বন্যা হয়েছিলো তার দুইটা চূড়ান্ত অবস্থা ছিলো। একটা ছিলো জুলাই-আগস্ট এবং আরেকটা ছিলো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেরটা ছিলো অতিবৃষ্টির কারণে। ৩৬ মিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ দেশের ২৫% লোক আক্রান্ত হয়েছিলো, ৬ লক্ষ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, ২ মিলিয়ন টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং ৩ মিলিয়ন পায়খানা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং মাথাপিছু গড় আয়ের ৩.৯% আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম এই বন্যার কারণে। পুষ্টির ওপর বন্যার কী প্রভাব পড়ে তা দেখার জন্য আমরা চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও মাদারীপুরসহ কিছু বন্যা-দুর্গত এলাকায় শিশু এবং তাদের সেবাযত্ন দানকারীদের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছিলাম। প্রায় চার মাসের ব্যবধানে আমরা দু'বার তাদের কাছে গিয়েছি। তুলনামূলক চিত্র দেখার জন্য যেসব এলাকা বন্যা-দুর্গত ছিলো না, যেমন পিরোজপুর,

রংপুর, ঝালকাঠি, খুলনা এবং আদমদিঘিতে গিয়েও আমরা উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। মোট ৮০০ শিশু ও সংশ্লিষ্ট সেবাযত্নদানকারী আমাদের সমীক্ষার মধ্যে ছিলো। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, প্রায় ৫০% বাড়িঘরের মেঝে পানিতে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং ৩৫% বাড়িতে রান্না করার জায়গা কিংবা রান্নাঘরও পানিতে তলিয়ে গিয়েছিলো। ৪০-৭০% বাড়িতে ঘরের ছাঁদও তলিয়েছিলো। এর ফলে শস্য নষ্ট হয়েছে, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলও বিপন্ন হয়েছে বা মারা গেছে। ৯০% ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি বন্যায় আক্রান্ত মানুষ নিজেদের বাড়িঘরেই ছিলো। তবে তারা কাজ করতে পারে নি। বাড়ির বড়রা কাজ করতে না-পারলে খাবার পাবে না এবং তখন অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রায় ৫০% বাড়ির লোকজন প্রায় দুই মাসের মত সময় কোনো কাজ করতে পারে নি। পুষ্টির ওপর এর প্রভাব ছিলো অপরিসীম। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে ৭০% লোক কোনো রিলিফ পায় নি। যারা রিলিফ পেয়েছে তাদের অধিকাংশই সরকারি সূত্রে পেয়েছে। আমরা জানি, সরকারি সংস্থা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আছে এবং ওরা সক্রিয় বলেই মানুষ রিলিফ পেয়েছে। আমরা মনে করি মাঠ-পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলো এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। প্রায় ৬০% বাড়িতে খাবার কিভাবে ক্রয় করবে, কিভাবে তারা তা আনবে সেটা ছিলো একটা বিরাট সমস্যা। বন্যার সময় গড়ে ৬ দিন তারা কোনো খাবার পায় নি। তবে এই ৬ দিন ধারাবাহিকভাবে নয়। কিছুদিন পর পর খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই প্রধান খাবার। কিন্তু ৬ মাস পার হলে তাকে যদি সম্পূরক খাবার না-দেওয়া হয় তবে অপুষ্টি দেখা দেয়। বন্যা-পরিস্থিতিতে প্রায় ৩০% শিশুর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সম্পূরক খাবার দেওয়া হয় নাই। এসময়ে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস বিরাট একটা সময়। শিশুকে সম্পূরক খাবার না-দেওয়া হলে সে অনিবার্যভাবে অপুষ্টির শিকার হবে। ৩০% ক্ষেত্রে ধার-কর্জ করে খাবার সংগ্রহ করতে হয়েছে। কারণ মানুষের সঞ্চয় তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। বন্যা-পরবর্তী সময়ে রোগ-বালাই বেড়ে গেছে এবং শতকরা ৭০ থেকে প্রায় ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা-পরবর্তী সময়ে ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বর, সর্দি-কাশি এবং নিউমোনিয়া হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রোগ-বালাই এবং এগুলো শিশুদের আক্রান্ত করে বেশি মাত্রায়। এতেও অপুষ্টি দেখা দেয়। অতএব বন্যা-পরবর্তী সময়ে অপুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ অপুষ্টির কারণে শিশুর শরীরবৃদ্ধি ঠিকমত ঘটে না, ওজন কমে যায়, শরীর ভেঙে পড়ে। অতএব বন্যাকালীন সময়ে বা বন্যার পর আমরা যদি সঠিকভাবে পুষ্টির ব্যবস্থা না-করি তবে এর পরিণতি হতে পারে খুব ভয়াবহ।

জরিপে দেখা গেছে, যেখানে বন্যা হয় নাই সেখানকার শিশুদের তুলনায় বন্যা-কবলিত এলাকার শিশুদের পুষ্টির অবস্থা খুবই খারাপ। ডায়রিয়া হলে শিশুর উচ্চতা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও ওজন কমে যায়। কাজেই অপুষ্টির একটি কারণ ডায়রিয়া এবং আরেকটা শুধুই বন্যা। দু'টোই অত্যন্ত মারাত্মক। দুই ক্ষেত্রেই শিশুর শরীরবৃদ্ধি, ওজন ও উচ্চতা কমে যায়। বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়নের সময় কথাটি বিবেচনায় রাখতে হবে। ভিটামিন এ সরবরাহ, টিকাদান কর্মসূচি, খাবার স্যালাইনের সঙ্গে জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়ানোর বিষয়গুলোর ওপর সরকারি কর্মকাণ্ডে জোর দিতে হবে। পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরকে মিলিয়ে একটা সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। যেসব বিদেশী বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের আরো এগিয়ে আসা উচিত।

আলাপ প্রসঙ্গে একদিন আমার এক সহকর্মী মুড়ির মোয়া সরবরাহের কথা বললেন। আমিও মনে করি মুড়ির মোয়া সহজে নষ্ট হয় না। তাই বন্যাকালীন সময়ে মুড়ির মোয়া সরবরাহ করে আমরা মুড়ি ও গুড়ের সমন্বয়ে মানুষের শর্করাজাতীয় খাবারের অভাব মিটাতে পারি। এটা খেয়ে বয়স্ক শিশু ও প্রাপ্ত-বয়স্করা অন্তত বেঁচে থাকতে পারে।

এরপর মুক্ত আলোচনার পর্বে বিশেষ অতিথি ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস বলেন:

বন্যাকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল কথা বিশুদ্ধ পানি খেতে হবে, পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, হাত ধুতে হবে এবং খাবার স্যালাইন খেতে হবে। আমি তার সাথে একটু যোগ করতে চাই: কারো যদি পেটের পীড়া বা ডায়রিয়া হয় তাকে যেন প্রয়োজনে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

ড. তাহমিদ-এর কথার সূত্র ধরে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক মি. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস বলেন:

ড. তাহমিদ যেসব সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন এসব বিষয়ে যা করার প্রয়োজন তার সবই আমরা করে চলেছি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা একাই পারে অনেক সমস্যার সমাধান করতে, সেটি পরিবার কল্যাণের সমস্যা হোক, সেটি রাজনৈতিক সমস্যা হোক, আর অর্থনৈতিক সমস্যা হোক। একইভাবে বলা যায়: পুষ্টি একাই পারে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান দিতে। যখন বন্যার মত দুর্যোগ হয়, তখন অনেক কিছুর সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের যে অবনতি ঘটে এর মূলে রয়েছে অপুষ্টি। যখন মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষাটাই বিপাকে পড়ে তখন পুষ্টির জন্য বাড়তি চিন্তার অবকাশ তার থাকে না। সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য কিছু তথ্য আমি একটু আগে সংগ্রহ করে রেখেছি। সেটি হচ্ছে আমরা কাজ করি বাংলাদেশের ৩৪টি জেলায়, ১০৫টি উপজেলায়। আমরা কাজ করি ২৩,২৪৬টি পুষ্টি কেন্দ্রের মাধ্যমে। এই ২৩,২৪৬টি পুষ্টি কেন্দ্র ১০৫টি উপজেলায় ব্যাপ্ত। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ১২টি উপজেলায় আমাদের ৭১১টি পুষ্টি কেন্দ্র এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি মনে করি, পুষ্টির ক্ষেত্রে যত সমস্যাই আসুক, আমরা তা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রফেসর ডাঃ ফাতেমা পারভীন চৌধুরী গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মায়েদের বন্যাকালীন সমস্যার কথার ওপর জোর দিয়ে বলেন:

বন্যায় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে বন্যা--এই দু'টি শব্দের বাইরে বোধ হয় আমাদের যাওয়ার সুযোগ ছিলো না, নেই, থাকবে না। বন্যার সময় মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবই বিপন্ন হয়ে পড়ে। ড. তাহমিদ আমাদের দেখালেন, পুষ্টির অভাবটাই সবার উর্ধ্বে। আমার মনে হয়, অপুষ্টি মোকাবিলায় পুষ্টি কার্যক্রমে যারাই জড়িত, যেমন আইসিডিডিআর,বি, এনএনপি এবং আইপিএইচএন--সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সার্বিক অবস্থাটা কী, কয়টা মেডিক্যাল টিম আছে, এগুলো ছক আকারে প্রত্যেক সিভিল সার্জনের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে রেগুলার রিপোর্ট আসছে। আমরা এগুলো আমাদের ডিজি মহোদয়ের ওখানে পাঠাচ্ছি, সেখান থেকে রিপোর্ট হচ্ছে, যে-রিপোর্ট আপনারা কিছুক্ষণ আগে উপদেষ্টা মহোদয়ের হাতে এবং সচিব মহোদয়ের হাতে দেখেছেন। এভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আরেকটা কাজ আমি করছি। বন্যা-উপদ্রুত এলাকায় আমাদের কিছু মাঠকর্মীকে পাঠিয়ে দিয়েছি কয়েকটা জিনিস মূল্যায়ন করার জন্য। এর মধ্যে প্রাধান্য পাবে পায়খানা করার ব্যবস্থা কেমন আছে। এর কারণ হলো বন্যার পরপর কৃমি-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাবে। ছয় মাসের কম-বয়সী শিশুদের কত অংশ শুধু-মাত্র মায়ের দুধ খাচ্ছে তা-ও দেখা হচ্ছে। যদি সে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খায় তার জন্য কোনো পানির প্রয়োজন হবে না। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করতে বলেছি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে এবং বন্যা-কবলিত এলাকাগুলোতে যে গর্ভবতী মা আছেন অথবা প্রসব-পরবর্তী মা আছেন তাদের পুষ্টির অবস্থাটা কী তা দেখার জন্য। যতটা সম্ভব এগুলো হিসাবের মধ্যে আসবে। তাতে আমরা একটা প্রাথমিক তথ্য পেয়ে যাবো এবং বিশেষ করে আইসিডিডিআর,বি ও এনএনপি-কে আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদেরকে এই কর্মযজ্ঞে সহায়তা করতে। অন্তত মহিলা, শিশু এবং মায়েদের জন্য যদি এগিয়ে আসি তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে হয়তো পুষ্টি সমস্যা থাকবে না। মোট ৫০% সমস্যা সমাধান করা সম্ভব মানুষকে সচেতন করে।

আইপিএইচএন বহুকাল ধরে যা করে আসছে আগামী ২৭ অক্টোবর সেভাবেই দেশব্যাপী ১-৫ বছরের শিশুদের ভিটামিন এ খাওয়ানো হবে, কৃমির অষুধ দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক জায়গায় বলা হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে যেন প্রত্যেককে ভিটামিন এ খাইয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও, আমাদের করণীয় আরো অনেক কিছু আছে যেটা ভবিষ্যতে আপনাদের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।

[বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় পড়ুন]

জেন্ডার বৈষম্য কিভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে

ফারজানা শাহনাজ মজিদ
আইসিডিডিআর,বি

বর্তমানে প্রজনন স্বাস্থ্যের ধারণা শুধুমাত্র মাতৃস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি শুধু মা ও বাবার জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং যেকোনো বয়সের নারী ও পুরুষের জন্যও তা প্রযোজ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বর্তমানে মানবাধিকার ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই নারীর শুধু মা হিসেবে নয় বরং নারী হিসেবেই প্রজনন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যত্ন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে বুঝায় পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থা, যা কেবল প্রজনন-সম্পর্কিত ত্রুটিহীন শারীরিক গঠন-প্রণালী, কিংবা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বা সন্তান জন্মদান-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার নিরোগ অবস্থা বা অক্ষমতা নয়।

জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব

আমাদের দেশে প্রতিটি বিষয়েই কন্যা-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পুত্র-সন্তানকে বংশ রক্ষা, আয়ের উৎস ও পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং বৃদ্ধকালে পিতামাতার আর্থিক নিরাপত্তাদানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে কন্যা-সন্তানকে আর্থিক দিক থেকে পরিবারের বোঝা হিসেবে মনে করা হয়। এই বিভেদমূলক আচরণের ফলে পরিবারে তথা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর একটি নাজুক ও নিচু অবস্থানের সৃষ্টি হয়। সকল বিষয়ে নারীর প্রতি এই নেতিবাচক মনোভাব তার স্বাস্থ্যে, বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এ-দেশে কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। পরিবারের স্ত্রী-সদস্যরা, কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো খোলামেলাভাবে আলোচনা করেন না। মাসিকের সময় সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং খাদ্য-সংক্রান্ত নানা ধরনের কুসংস্কারের শিকার হওয়ায় কিশোরীরা পুষ্টিহীনতা ও রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

দরিদ্রতার কারণে কিশোরী ও নারীরা নানাভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে তারা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগে আক্রান্ত হয়।

১৮ বছর বয়সের আগে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণতা আসে না। এসময়ে বিয়ে দিলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার, সন্তান গ্রহণ, ইত্যাদি সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। পরিবারে মেয়েটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার না-থাকায় বিয়ের পর স্বামী, শাশুড়ি বা বাড়ির অন্য লোকজনের চাপে তাকে সন্তান গ্রহণে বাধ্য করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুত্র-সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে বার বার গর্ভধারণ করতে বাধ্য করা হয়। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা ও মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। শিশুমৃত্যুর হারও বেশি হয় এবং কম-ওজনের শিশুর জন্ম হয়।

গর্ভকালীন সময়ে নারীর প্রতি বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন সময়ে স্বামী, শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গর্ভবতী মহিলাকে যথাযথ সেবাযত্ন প্রদান করে না।

গর্ভকালীন বা গর্ভপরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে না-যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার ও বিশ্রাম না-দেওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন পরিবেশে প্রসব করানো, প্রসবের পর ভারী কাজ করানো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার না-দেয়া, ইত্যাদি অবস্থা আমাদের সমাজে বিরাজ করছে। এছাড়া, কুসংস্কারের কারণে খাদ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন বাছ-বিচারসহ প্রসূতিকে অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। এসব আচরণ নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

কাজের সুযোগ কম থাকায় নারীরা স্বল্প মুজুরিতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে। প্রয়োজনে এরা বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়।

নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকা

কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে শারীরিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকে। পিতা ও বাড়ির পুরুষ-সদস্যদের উচিত কিশোরীদের শারীরিক সমস্যা ও ফলাফল সম্পর্কে বাড়ির মহিলাদের সচেতন করা। কিশোরীদের বাল্যবিবাহ না-দেওয়ার ব্যাপারে পরিবারে পিতা ও অন্যান্য পুরুষ-সদস্যদের বিশেষভাবে সচেতন হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এ-বিষয়ে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে ৩ বার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, পরিমাণে বেশি ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া, বিশ্রাম নিতে দেওয়া, বিশেষত দিনের বেলায় ১ ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে দেওয়া, স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না-করা এবং স্ত্রীকে মানসিক প্রশান্তিতে রাখার ব্যাপারে স্বামীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। পুরুষদের উচিত মাতৃস্থানীয় মুরব্বিদের ও বাড়ির অন্যান্য মহিলা সদস্যদের এসব বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করা।

গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব

গর্ভ ও প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসব-পরবর্তী বিপদ-চিহ্নগুলো সম্পর্কে, এগুলো থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্যসমস্যা ও পরিণতি সম্পর্কেও স্বামীসহ পরিবারের পুরুষ-সদস্যদের অবহিত হতে হবে।

সন্তান জন্মদান, এমনকি সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোও প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত বিষয়। একটি শিশুর যত্ন ও পরিচর্যাকারী হিসেবে সাধারণত কেবল মাকেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্বও অনেক। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় খাদ্য, পুষ্টি, সেবাযত্ন, টিকাদান, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মায়ের পাশাপাশি পিতারও সমান দায়িত্ব পালন করা উচিত।

বিয়ে, সন্তান গ্রহণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে

বাংলাদেশে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের বিষয়গুলো যেন একেবারেই মহিলাদের নিজস্ব জগতের ব্যাপার। আর মহিলারাও বিষয়গুলোকে এভাবেই রাখতে চান। এসব বিষয়ে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো যথেষ্ট তথ্য অনেক সময়ই পুরুষদের কাছে থাকে না। এজন্য এসব বিষয় সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েই পুরুষদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

যৌনরোগ প্রজনন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত-থাকা পুরুষের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক। ঝুঁকিপূর্ণ পেশার ধরনই মানুষকে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের দিকে টেনে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা কনডম ছাড়াই যৌনকর্মীদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। এর ফলে সে নিজে যৌনরোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তার স্ত্রীও যে আক্রান্ত হবে সে-সম্পর্কে তার ধারণা নেই। তাই ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুরুষদের বিস্তারিত ধারণা থাকা খুবই জরুরী। যদি কোনো কারণে স্বামী অথবা স্ত্রী যৌনরোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে উভয়েরই একসাথে চিকিৎসা নেওয়া দরকার এবং চিকিৎসার মেয়াদ পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে পুরুষদেরই বিশেষভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। ■

আইসিডিডিআর,বি স্টাফ ক্লিনিক থেকে

জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রাথমিক পরিচর্যা

উচ্চমাত্রার জ্বর

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কারো শরীরের তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে এ-অবস্থাকে আমরা 'জ্বর' বলে থাকি। এই তাপমাত্রা বেড়ে যখন ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়েও বেশি হয় তখন তাকে উচ্চমাত্রার জ্বর বলা হয়। উচ্চমাত্রার জ্বর বেশিক্ষণ থাকলে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতির পরিমাণ বেশি। তাই জরুরী ভিত্তিতে উচ্চমাত্রার জ্বর কমানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কিভাবে উচ্চমাত্রার জ্বর কমাবেন

প্রথমে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপুন। জ্বর কমাবার অষুধ (paracetamol) খাইয়ে দিন। যদি রোগী শীত অনুভব করে তবে বুঝতে হবে জ্বর আরো বাড়বে। মাথায় ট্যাপের পানি ঢালুন বা আইস-ক্যাপ দিন এবং শরীর কাঁথা/কম্বল/লেপ দিয়ে ঢেকে রাখুন যতক্ষণ রোগী শীত অনুভব করে। অষুধ খাওয়াবার আধঘণ্টা পর শীত-অনুভব করার ভাবটা কমে যাওয়ার কথা। যদি তাই ঘটে তবে শরীরের ভারী কাপড় সব খুলে ফেলুন। ফ্যান ছেড়ে দিন। এবার ট্যাপের পানিতে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে পানি নিংড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর মুছতে থাকুন যতক্ষণ না জ্বর ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এ নেমে আসে। জ্বর কমে গেলে মাথা ভালো করে মুছে দিন এবং রোগীকে স্বাভাবিক কাপড় পরিয়ে রাখুন।

খিঁচুনি

খিঁচুনি অনেক কারণে হতে পারে। তার মধ্যে মৃগী রোগীর যে-খিঁচুনি হয় তার সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কমবেশি পরিচিত। এছাড়া শিশুদের উচ্চমাত্রার জ্বরের সময় খিঁচুনি হতে পারে। যে কারণেই হোক, পরিবারে কারো খিঁচুনি হতে দেখলে প্রথমে রোগীকে বিছানায় শোয়াতে হবে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস যাতে ঠিকমত নিতে পারে সেজন্য শ্বাসনালীর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুখে লালা, খাবার বা ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। জিহ্বা যেন পিছনে চলে গিয়ে শ্বাসনালী বন্ধ করে না-দেয় বা দাঁত দিয়ে জিহ্বা না-কাটে সেজন্য মুখে চামচ দিয়ে দাঁত থেকে জিহ্বাকে সরিয়ে রাখতে হবে। মৃগী রোগীর খিঁচুনি বেশিক্ষণ থাকলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

উচ্চমাত্রার জ্বরের জন্য শিশুর খিঁচুনি হলে জ্বর কমাবার সব ব্যবস্থা নিতে হবে। কয়েক মিনিটের

খিঁচুনিতে হাত-পা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রকম বিকৃতি ঘটে (ছবি: ইন্টারনেট)

মধ্যে খিঁচুনি না-থামলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে। সাধারণত শিশুদের ৬ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চমাত্রার জ্বরে খিঁচুনি হতে পারে। সেজন্য ৬ বছর বয়স পর্যন্ত এসব শিশুর জ্বর হলেই চিকিৎসকের পূর্ব-নির্ধারিত ডোজে ডায়াজিপাম টেবলেট খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং কমপক্ষে ৫ দিন বা যতদিন জ্বর থাকে ততদিন খাওয়াতে হবে। জ্বর যাতে ১০০ ডিগ্রির উপরে উঠতে না-পারে সেজন্য প্যারাসিটামল প্রয়োজনে ৪ ঘণ্টা পরপর খাইয়ে যেতে হবে। যাদের মৃগী রোগ আছে তাদের জন্য আরো কিছু পরামর্শ হলো:

- মৃগী রোগীকে একা কোথাও যেতে দিবেন না
- পুকুর-নদী-বিল-ঝিলে গোসল করতে দিবেন না
- চুলার কাছে যেতে দিবেন না
- একা-একা কোনো মেশিনে কাজ করতে দিবেন না
- মৃগী রোগগ্রস্ত লোক কখনো গাড়ি চালাবে না
- বাথরুম ব্যবহারের জন্য ভিতরে ঢুকলে সিটকিনি লাগাবে না
- চিকিৎসকের পরামর্শ মত অষুধ চালিয়ে যেতে হবে (খিঁচুনিমুক্ত অবস্থায়ও কমপক্ষে ৩ বছর)

পুড়ে-যাওয়া

দৈনন্দিন কাজে, বিশেষ করে রান্নাঘরে যারা গরম পানি, গরম খাবার বা আগুন নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকা দরকার। সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। শরীরের চামড়া পুড়ে যায়, কাপড়ে আগুন লাগে। কাপড়ে আগুন লাগলে কখনো দৌড়াবেন না বা কাপড় ঝাড়বেন না। দ্রুত শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলবেন অথবা কম্বল, কাঁথা, বস্তা, ইত্যাদি দিয়ে আগুন-লাগা জায়গাটাতে চেপে ধরবেন। এরপরও যদি শরীরের কোনো অংশ পুড়ে যায় তবে সে-অংশটি সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখবেন বা কমপক্ষে আধাঘণ্টা ধরে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকবেন ।

চামড়ায় ফোস্কা পড়লে নিজেরা গালাবেন না। পোড়া জায়গায় সিলভার সালফাডায়াজিনজাতীয় মলম লাগাতে পারেন। ফোস্কা গলে গেলে পরে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাবেন। ধনুষ্টংকারের প্রতিষেধক টিকার পূর্ণ ডোজ অবশ্যই আগে থেকে সবার নিয়ে রাখা উচিত। না নিয়ে থাকলে দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে টিটেনাস ইনজেকশন দিয়ে দিতে হবে। পোড়ার পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। পোড়া জায়গায় যন্ত্রণা বেশি হলে প্যারাসিটামল ও ঘুমের অষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। শিশুদেরকে ফেনারগন সিরাপ ও প্যারাসিটামল সিরাপ দেওয়া যেতে পারে।

নাক দিয়ে রক্ত-পড়া

অনেক সময় দেখা যায় হঠাৎ করে পরিবারের কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। তখন সবার মধ্যে একটা চরম আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। আতঙ্কিত না-হয়ে বরং জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগীর এ-অবস্থা দেখা দেয় তবে তাড়াতাড়ি রক্তচাপ মাপার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বেশি রক্তচাপ হলে তা কমাবার পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাকের ভিতরের ময়লা জোর করে সাফ করার পর একটু ছুলে গিয়ে রক্ত-পড়া শুরু হতে পারে। নাকের এ-অংশে রক্ত চলাচল খুব বেশি হয়, তাই সহজে রক্ত-পড়া বন্ধ হতে চায় না। যে কারণেই নাক দিয়ে রক্ত পড়ুক না কেন, রক্ত-পড়া বন্ধ করতে হলে আপনাকে দুই আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরতে হবে এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। ১ মিনিট পরপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য চাপটা একটু ঢিলা করতে হবে। তারপর আবার চেপে ধরতে হবে। এভাবে ২০ মিনিট ধরে রাখতে হবে এবং এ-সময়টিতে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হবে। আশা করা যায়: এসময়ের মধ্যে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি না-হয় তবে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে অথবা নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ■

ডাঃ এম মতিউর রহমান